Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 177-190
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি: টেকসই উন্নয়নে অশনি সংকেত

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সারকথা: *আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়নের পথে একটি মৌলিক বাধা হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষা যেমন উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার তেমনি এক্ষেত্রে নানা ত্রুটি ও অসঙ্গতি উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক। বক্ষ্যমান আলোচনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং এই সংস্কৃতির নেতিবাচক দিক প্রাধান্য পেয়েছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সুষম ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। পরিশেষে, একটি সুষম ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।*

১. ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থায় এখন কর্পোরেট সংস্কৃতি চালু হয়ে গেছে। এদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সেবা প্রদানের নামে কর্পোরেট পুঁজির প্রত্যক্ষ ছত্র-ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সব স্তরে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নামে এসব প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট আদলে পরিচালিত হচ্ছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে কিছু ব্যক্তি রাতারাতি শিক্ষানুরাগী, শিক্ষাবিদ সেজে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে লাভবান হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সমগ্র দেশ ও জাতি, পুরো শিক্ষাব্যবস্থা। পরিতাপের বিষয়, রাষ্ট্র কাঠামো দেশ ও জাতির দিকে না তাকিয়ে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের লাভের পথ সুগম করে দিচ্ছে।

প্রকৃত শিক্ষার উন্নয়নে ও শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত বিস্তারে গণমুখী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা হবে সুলভ, সহজলভ্য ও গণমুখী। আমাদের দেশের প্রকৃত বাস্তবতায় যে কোন মূল্যে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙ্গে একটি যুগোপযোগী বাস্তবসম্মত গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু জরুরি। জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এ উল্লেখ আছে, এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট

ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ এরকম বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা চালুর পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট সংস্কৃতি এদেশের শিক্ষার অগ্রযাত্রায় এক বিরাট বাধা।

একটি প্রতিষ্ঠান যদি এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে পারে আর প্রতি জনের কাছ থেকে ভর্তি ফি বাবদ বছরে ১০০০০ টাকা আদায় করে তাহলে ভর্তি ফি হতে বার্ষিক আয় হয় ১ কোটি টাকা। জনপ্রতি প্রতি মাসের বেতন ৫০০ টাকা ধরা হলে বেতন বাবদ বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা। এছাড়া বই, খাতা, মনোগ্রাম, জরিমানা, পোশাক, আইডি কার্ড, শিক্ষা সফর, পরীক্ষা ফি ইত্যাদি ছোটখাট অনেক বিষয়ে ফি ধার্য করে সরল হিসাবে বছরে ২ কোটি টাকা আদায় করা যায় সহজেই। এর জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগেরও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল উদ্যোগ, সামান্য জমি, সাদামাটা একটি বাড়ী, দু'য়েকটি ফ্লাট (ভাড়া করা হলেও চলে)। এখন ব্যয়ের প্রসঙ্গে আসি। যদি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ২০ জন হয় এবং প্রতিজনের মাসিক বেতন ৫০০০ থেকে ১০০০০ টাকা ধরা হয় তাহলে বাৎসরিক ব্যয় কত হয়? সরল হিসাবে ১২ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ টাকা। অন্যান্য ব্যয়সহ মোট ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা ধরে নেই। বাকী আয়ের ভাগীদার উদ্যোক্তা। কত সরল হিসাব। এটি সাধারণ একটি কিন্ডার গার্টেন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্পিত হিসাব হলেও দেশের বাস্তব চিত্র তেমনি। কত সহজেই আয় করা যায়। শিক্ষাসেবা প্রদানের নামে কত নিরাপদে বিপুল অর্থ উপার্জন করা যায়। এতে প্রয়োজন হয় কেবল কোন মতে সুনাম অর্জন করা। ঢাকাসহ বড় বড় শহরে এখন এরকম প্রতিষ্ঠান অনায়াসেই স্থাপন করা যাচ্ছে।

এধরনের উদ্যোগ ব্যক্তি, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক। কিন্তু দেশ, জাতি, গণমানুষের অগ্রগতি, উন্নয়ন তথা পুরো শিক্ষাব্যবস্থার ওপর এক ভয়ংকর আঘাত।

শিক্ষাসেবার নামে কত সহজে মুনাফা উপার্জন করা যায়। ঢাকা শহরে এ প্রবণতা বেশী। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে এমনকি উপজেলা শহরগুলোতেও এখন এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে এই শিক্ষা বাণিজ্য। যেন দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতি মনিটরিং হয় বলে মনে হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এ সংস্কৃতি এদেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে যাচ্ছে এক অনিশ্চিত গন্তব্যে।

স্বচ্ছল ব্যক্তির হাত ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার বিষয়টি নতুন নয়। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, শুরু থেকেই স্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠেছে। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বেশী দিনের নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটিশরা তাদের ছত্র-ছায়ায় এদেশে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। পরবর্তীতে জমিদার, প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমান সময়ে অবস্থা এমন যে, স্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই।

বর্তমানে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি মানেই স্বচ্ছল ব্যক্তি। আগে স্বচ্ছল ব্যক্তির বাইরেও কিছু শিক্ষিত শিক্ষানুরাগী অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার নজির আছে। বর্তমানে তা নেই বললেই চলে। আগে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে এলেও তারা তা করেছে এলাকার স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে। আর এ যুগে স্থাপন করা হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, মুনাফার বিষয়টি মাথায় রেখে। গুটি কয়েক ব্যতিক্রম বাদে এ চিত্রই দেশব্যাপী দেখা যাচ্ছে। তার মানে, আগে শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিরা ছিল স্বচ্ছল এবং একই সাথে সজ্জন। এ যুগে শিক্ষানুরাগীরাও স্বচ্ছল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সজ্জন বলা যাবে কি?

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো সুনাম অর্জনে ব্যতিব্যস্ত থাকে। একবার সুনাম অর্জন করতে পারলেই হয়। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। সবাই তাদের ছেলে মেয়েদের এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠান এ সুযোগ কড়ায়-গন্ডায় কাজে লাগায়। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকে। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার হার থাকে তুলনামূলক অনেক কম।

চাকচিক্য বা বিলাসিতার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা নেই। প্রকৃত অর্থে, শিক্ষিত হতে হলে শিক্ষার্থীকে হতে হবে অতি সাধারণ, সাদামাটা। বিলাসিতার মাঝে বড়, শিক্ষিত হতে পেরেছে এমন নজির সম্ভবত নেই। সুতরাং, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে শিক্ষার্থীকে সাদামাটা সাধারণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এ সংস্কৃতি ক্ষয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত মানুষগুলো ক্রমান্বয়ে লেবাসধারী হয়ে উঠছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে গড়ে তোলার চেয়ে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো চাকচিক্যময় করে গড়া তোলা হচ্ছে।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছরের ফলাফল কেমন হওয়া উচিৎ। এর সরল উত্তর কিছু শিক্ষার্থী খুব ভালো ফলাফল করবে। মধ্যম সারির বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থী মাঝামাঝি পর্যায়ে ফলাফল করবে। কিছু ফেল করবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বছরের ফলাফল এমন হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে শতভাগ পাশ করতে পারে না। শতভাগ ফেলও করতে পারে না। যদি বছরের পর বছর একটি প্রতিষ্ঠান ভালো ফলাফল করে তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবাই আকৃষ্ট হবে। সবাই চাইবে তার ছেলে-মেয়েকে ঐ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে। ভর্তির জন্য শুরু হবে অসুস্থ, তীব্র প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতায় স্বল্প আয়ের মানুষেরা পরাস্ত হয়, হয়ে চলছে। এটি মোটেও কাম্য নয়। অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও এই অনৈতিক কাজ করে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষাসেবাকে কেবল মাত্র স্বচ্ছল ঘরের ছেলে-মেয়েদের জন্য নিশ্চিত করে মুনাফা অর্জন করে চলছে।

বাংলাদেশের মত দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে সবার আগে। একই সাথে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে এর কোন বিকল্প নেই। যে কোনো মূল্যে দ্রুততম সময়ে সব মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নারী শিক্ষার প্রচলন বিশেষ করে, মুসলিম নারীদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নারী শিক্ষার তিন অগ্রদূত ফয়েজন্নেসা চৌধুরী, খায়েরুন্নেসা খাতুন, এবং বেগম রোকেয়া আজীবন নিরলস কাজ করে গেছেন। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা শহরে ফয়েজন্নেসা চৌধুরী, ১৮৯৫ সালে সিরাজগঞ্জ মহকুমার হোসেনপুর গ্রামে মুনশি মেহেরুল্লা ও খায়েরুন্নেসা খাতুন এবং ১৯১১ সালে কলকাতায় বেগম রোকেয়া মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আগে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা শত প্রতিকূলতার মাঝেও শিক্ষা বিস্তারে নিরলস কাজ করে গেছেন। এ যুগে কর্পোরেট সংস্কৃতি শিক্ষা অনুরাগীর নামে মূলত উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তুলছে। কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন, 'কোন জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি তার শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য'। জ্যাঁ জ্যাকস রুশোর শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার প্রতিবন্ধক। এদেশে শিক্ষা প্রসারে এবং শিক্ষার প্রকৃত মান উন্নয়নে প্রধান বাধা শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি। আলোচ্য প্রবন্ধে শিক্ষা বাণিজ্যকরণ কিভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে? টেকসই উন্নয়নে কিভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে? এ বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কিভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এ বিষয়ে আলোকপাত করা। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যে কোনো মূল্যে এই সংস্কৃতিকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি কী, এর স্বরূপ ও কারণ আলোচনা করা।
২. শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকগুলো আলোকপাত করা।
৩. শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার পেছনে গণমাধ্যমের ভূমিকা তুলে ধরা।
৪. কর্পোরেট সংস্কৃতির কবল থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করতে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা।

৩. তথ্য ও পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য মাধ্যমিক উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ অর্থনীতির সমিতিসহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নাল, বিভিন্ন গ্রন্থ, ইন্টারনেট, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রবন্ধের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে কতিপয় পর্যবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি কী এবং এর স্বরূপ?

শিক্ষাব্যবস্থায় কর্পোরেট সংস্কৃতি কী? এ বিষয়ে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়া কঠিন। সরল কথায় বলা যায়, শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ বা শিক্ষার মত একটি অতীব জরুরি সেবাকে পণ্যে পরিণত করার প্রক্রিয়াই কর্পোরেট সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির আড়ালে লুকিয়ে আছে অর্থ লিপ্সা। মুনাফালোভীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের নামে মুনাফা অর্জনই এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। ফলে সব স্তরের সব মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার কথা উপেক্ষা করে কেবল স্বচ্ছল ঘরের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা নিশ্চিত করা কর্পোরেট সংস্কৃতির একটি নিন্দনীয় দিক। মুনাফার চিন্তা আছে বলে এখানে সনদ বাণিজ্য, জালিয়াতি, অধিক ফি আদায়, তথ্য গোপনের মতো গুরুতর অভিযোগ আছে। শিক্ষা প্রদানের আড়ালে এসব অনৈতিক কাজ হবেই বা না কেন? কর্পোরেট সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য শিক্ষা প্রদান নয়, মুনাফা অর্জন। শিক্ষা প্রদান উপলক্ষ মাত্র।

বিনয় মিত্র তার 'বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা রূপ ও রীতি' নামক গ্রন্থে "আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, এখন আর বিদ্যাগ্রহীতা নয়, বিদ্যাক্রেতা" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, "বিদ্যা, যা আগে ছিল পূজার পর্যায়ে, একদিন তা হলো আত্মোজ্জ্বল হওয়ার অলংকার। পরে হলো চাকরিপ্রাপ্তির অস্ত্র, এখন হয়েছে বাজারি পণ্য। শিক্ষালয় নামক সুদৃশ্য ভবনগুলো পবিত্রতা হারিয়ে, যেন একেকটা বিপনি-বিতান হয়ে উঠেছে। শিক্ষা এখন চড়ামূল্যের পণ্য, যার খুচরা ক্রেতার নাম ছাত্র, খুচরা বিক্রেতার নাম শিক্ষক, এর পাইকার ব্যবসায়ী হলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, অথবা ক্ষমতাসীন কোন রাজনীতিক। যারা বিদ্যালয়ের দেহ গড়েন, বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়-মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে যথাযথ স্বীকৃতি বা অনুমতিপত্র নিয়ে আসেন, তারা বহু টাকা বিনিয়োগ করেন অবশ্যই। বিনিয়োগকৃত টাকা থেকে মুনাফা

না এলে ব্যবসায়ী তার টাকা খাটাবেন কেন? লাভ বিনা টাকা দান, জনকল্যাণমূলক নিঃস্বার্থ বিনিয়োগ- বর্তমান বঙ্গীয় সমাজে এমন উদার, নির্মোহ ব্যক্তির দেখা মেলা ভার। সত্যি তাই। শিক্ষার লক্ষ্য চাকরি নয়, জ্ঞানার্জন। জ্ঞানের আলোই নিজেকে আলোকিত করে সে আলোয় অন্যকে আলোকিত করবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সুশিক্ষিত হওয়া, সুন্দর মনের মানুষ হওয়া - দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে, এই মূল্যবোধের অবনতি হচ্ছে, অবক্ষয় হচ্ছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন শিক্ষিত হয়ে যেনতেনভাবে অর্থ উপার্জন করা। যে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ সৎ, উদার, কর্মঠ, মুক্তবুদ্ধির মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে সে শিক্ষাই এখন মানুষের এসব মূল্যবোধে কুঠারাঘাত করে চলছে। সংকোচিত হতে চলছে সুকুমারভিত্তি, মননশীলতা, মানবিকতার চর্চা। শিক্ষা এখন মুনাফা অর্জনের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে। দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩তম সমাবর্তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে টিউশন ফি কমানো এবং দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার প্রচুর সুযোগ আছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আহবান জানান।" সমাবর্তনে তিনি আরো বলেন, "Keep in mind that education shouldn't be only based on curricula and certificates, and universities should not be merely profit-making organizations" (The Daily Star, 10 January, 2010).

অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে যা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কোচিং সেন্টার স্থাপন করে অনেক উদ্যোক্তা কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। প্রচুর বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয়ে গেছেন রাতারাতি এমন নজির পাওয়া যাবে অনেক। কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্যের হিসাব জানতে দেশে প্রথমবারের মত একটি জরিপ পরিচালনা করে সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। জরিপে দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থী বছরে তার শিক্ষার পেছনে যে টাকা ব্যয় করে, তার মধ্যে ৩০ শতাংশ চলে যায় কোচিং আর হাউস টিউটরের ফি বাবদ। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী বছরে তার পেছনে যে টাকা ব্যয় করে, তার মধ্যে ৩০ টাকা খরচ হয় কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনিতে (কালের কণ্ঠ ২৯ এপ্রিল, ২০১৬)।

একজন ব্যক্তি যার জীবন মুনাফার জন্য নিবেদিত। মুনাফার পেছনে ছুটে প্রচুর অর্থ কড়ি, বিত্ত বৈভবের মালিক বনে গেছেন। এরকম একজন দেশ ও জনগণের কথা চিন্তা করতে পারে না। চিন্তা করার কথাও না। মুনাফালোভী অর্থলিপ্সু একজন মানুষ সব সময় নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনের ভোগ বিলাসিতা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকে। হতাশাজনক সত্য এরকম মুনাফালোভী ব্যক্তিবর্গ আজ রাতারাতি শিক্ষানুরাগী বনে যাচ্ছে। এ দেশের আইন, রাজনীতি, প্রশাসন তাদের অনুপ্রাণিত করছে। কর্পোরেট আদলে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একই নামে বিভিন্ন শহরে অথবা একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে চলছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শ্রমজীবি স্বল্প আয়ের মানুষের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করার ন্যূনতম কোন সুযোগ নেই। আর্থিক স্বচ্ছলতা এসকল প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করার মূল মানদণ্ড। শিক্ষা বাণিজ্যকরণ আজ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে পড়াশুনার অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। উল্টো তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। শিক্ষা বাণিজ্যকরণের এই সংস্কৃতি এমন এক পর্যায়ে যাচ্ছে যে, শিক্ষা আজ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য দুর্লভ পণ্যে পরিণত হচ্ছে। আর তা কর্পোরেট পুঁজির কাছে দিনে দিনে জিম্মি হতে চলছে, যেন কৃত্রিম সংকট তৈরী করে দাম বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

শিক্ষা লাভের অধিকারটুকু ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মোতাহার হোসেন চৌধুরী তাঁর 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন, "মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা

করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানব সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানব সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে।" শিক্ষা মানুষকে মানবিক করে তোলবে। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই হওয়া উচিৎ। এদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক। প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়বদ্ধতার দিক বিবেচনায় স্বল্প আয়ের মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিৎ। শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি এ বিষয়টিকে শতভাগ অস্বীকার করে। এতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, শিক্ষার গুণগত মান ক্ষুন্ন হচ্ছে, থমকে আছে শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি। কেবল স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা নিশ্চিত করা দেশ ও জাতির কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। দেশের প্রকৃত উন্নয়নে যে গণমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তার পথ সত্যিকার অর্থে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো শিক্ষা দানের পাশাপাশি শিক্ষক কর্মচারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, তাদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা। এজন্য প্রয়োজন আর্থিক ও অআর্থিক সব সুবিধা নিশ্চিত কল্পে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শিক্ষা বাণিজ্যকরণ এদিকে কোনো চিন্তা করে না, করার প্রয়োজনও মনে করে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি শিক্ষক কর্মচারীদের মুনাফা লাভের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। এখানে একজন শিক্ষক শ্রমিক হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এছাড়া চাকুরীর স্থায়িত্ব, আবাসন সুবিধা, একেবারেই নগণ্য। বাণিজ্য করার নিমিত্তে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত চিত্র এমনই। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারিদের বেতন ভাতা সময় বিবেচনায় নিতান্তই কম। প্রশ্ন হলো, এসব প্রতিষ্ঠানে স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা করছে কেন? দেখা যাবে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করে বলে টিউশনি, কোচিং বাণিজ্য করে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়। হচ্ছেও তাই। এক্ষত্রে নীতি নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা, দায়িত্ববোধ বিবেচনা করা হচ্ছে না। প্রাইভেট টিউশনি করে সহজেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় বলে বেতন ভাতার গুরুত্ব কমে যায়। কিছু বেকার যুবক বাধ্য হয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে কেবল রুটি-রুজির জন্য শিক্ষকতা করতে বাধ্য হচ্ছে। বাস্তব চিত্র এমন যে, একটি কলেজ পর্যায়ের স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন শিক্ষক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরি পেয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি কোনটি বেছে নেবেন? এক্ষেত্রে কলেজের চেয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা তার কাছে বেশী লোভনীয় নয় কি?

শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির নেপথ্য কারণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক সংকট, শিক্ষকদের বাণিজ্যিক মনোভাব, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের না আসা, অবকাঠামোগত সমস্যা ইত্যাদি। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের একটি বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে এই বলে যে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তেমন পড়াশুনা হয় না। সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার মানোন্নয়নে নিবেদিত বলা হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। এখনো গ্রামের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে ভাঙ্গাচোড়া, শিক্ষক সংকট, অনুন্নত রাস্তঘাটসহ অনেক সমস্যা। গত ২৭ মে, ২০১৫ ইং তারিখে কালের কণ্ঠ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ২০১২ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬ হাজার। ২০১৩ থেকে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো ২৬ হাজার। সাত বছর ধরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। ফলে পুরণো সেই ৩৬ হাজার বিদ্যালয়ের ১৫ হাজারেই নেই প্রধান শিক্ষক। বেশির ভাগ স্কুলেই শিক্ষক সংখ্যা চারজন। প্রধান শিক্ষক না থাকলে বাকি তিন জনের মধ্য থেকে একজনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্যস্ত থাকতে হয় প্রশাসনিক, এবং সরকারি ও স্থানীয় নানা কাজে। ফলে দুজনকেই মূলত চালাতে হয় ক্লাস। একটি স্কুলে

প্রাক-প্রাথমিকের ক্লাসের সময় আড়াই ঘণ্টা। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে চারটি ক্লাস এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৪৫ মিনিটের ছয়টি ক্লাস হওয়ার কথা। কিন্তু দুজন শিক্ষকের পক্ষে এত ক্লাস নেয়া আদৌ সম্ভব নয়। কোনো রকমে এসব স্কুলে সিলেবাস শেষ করানো হলেও শিশুরা আসলে কতটুকু শিখছে, সে প্রশ্ন শিক্ষাবিদদের। ২০১৫ সালের ০৩ ফেব্রুয়ারি কালের কণ্ঠ পত্রিকার 'পাহাড়চূড়ায় শিক্ষা লড়াই' শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৮ সালে জাতীয়করণ করা হলেও রোয়াংছড়ির সাইঙ্গ্যাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষের সংকটে শিশু শ্রেণির ছুটির পর ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বসানো গেলেও সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বসতে হয় খোলা আকাশের নীচে। গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লিখে ক্লাস নেন শিক্ষক। আর শিক্ষার্থীরা শিক্ষা নেন একনিষ্ঠ মনে। এ চিত্র দুই-এক দিনের নয়, সারা বছরের।

প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও শিক্ষা খাতে ব্যয় কিন্তু কম নয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭১০৩ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৮৪৭ কোটি টাকা এবং এক বছরে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির হার প্রায় ৫৭ শতাংশ (Dhaka Tribune, 03 June, 2016)। প্রতি বছর বাজেটে ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষা খাতের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে। এর পরেও সারা দেশে রোয়াংছড়ির সাইঙ্গ্যাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়ে গেছে। তার মানে দাঁড়ায় শিক্ষা খাত উন্নয়নে নিরন্তর প্রচেষ্ঠা চলছে বলা হলেও এখাত উন্নয়নে আমরা সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত ব্যয় নিশ্চিত করতে পারছি না। শিক্ষায় কর্পোরেট সংস্কৃতি বিস্তারে এটি একটি অন্যতম কারণ।

এসব কারণে সবাই মনে করে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন আর আগের মত পড়াশুনা হয় না। ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাকচিক্য দেখে সবাই আকৃষ্ট হয় এবং মনে করে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার মান অনেক ভালো। বিশেষ করে শিক্ষিত, সচেতন, স্বচ্ছল মানুষেরাই তাদের ছেলে মেয়েদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াতে আর আগ্রহী নয়। বিশেষ করে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে-মেয়েদের পড়াতে তাঁরা ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেই বেছে নেয়।

২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যারা সচিব পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন বা অধিষ্ঠিত হয়ে অবসরে গেছেন ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে তাদের কৈশোর জীবন কেটেছে। এটি সত্য যে তাঁদের অধিকাংশই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রামে বা মফস্বল শহরে পড়াশুনা করেছেন। আর তখনকার সময়ে পড়াশুনা করার প্রধান অনুসঙ্গ ছিল হারিক্যান। বিদ্যুতের ব্যবহার তেমন ছিল না বলে গ্রাম ও মফস্বল শহরের শিক্ষার্থিদের হারিক্যানের আলোই পড়াশুনা করতে হয়েছে। আর হারিকেনের আলোয় পড়াশুনা করে ঐ সময়ে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের মানসিকতা এমন পর্যায়ে যে, হারিক্যানের আলোই পড়াশুনা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আজ তারাই তাদের ছেলে মেয়েদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে পড়াশুনা শেখানো হয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে চায়। যে ব্যক্তি হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশুনা করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনিই তার ছেলে মেয়েদের পড়াশুনায় বিলাসবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের প্রয়োজন অনুভব করেন। প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, স্বচ্ছল ঘরের মানুষগুলো সচেতন নয়। একজন সত্যিকার সচেতন মানুষ তার ছেলে মেয়েদের সাধারণ হতে উদ্ভুদ্ধ করবে। সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করার জন্য প্ররোচিত করবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মন-মানসিকতা ক্রমশ বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি গড়ে উঠার পেছনে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনেকাংশে দায়ী। এ সংস্কৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক ভয়ানক ব্যাধি হলেও সরকার, শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম,

গবেষক, তথা সচেতন মহল এ বিষয়ে চরম উদাসীন। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি এক প্রতিষ্ঠিত রূপ পেতে যাচ্ছে।

৫. কর্পোরেট সংস্কৃতির নেতিবাচক দিক

শিক্ষা বাণিজ্যকরণ শিক্ষা ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে এই সত্যতা মেলে। মালিকে মালিকে দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আলাদা আলাদা ক্যাম্পাস স্থাপন, দীর্ঘদিনেও স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে না তোলা, বিনা নোটিশে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া, অর্থের জন্য শিক্ষার্থীদের হয়রানী, অযৌক্তিক ফি আদায় এমন কি কাউকে না জানিয়ে মালিকদের পলায়নের মত ঘটনা গণমাধ্যমের বদৌলতে দেখতে পাই। উচ্চ শিক্ষার নামে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও মুনাফা লাভের নেশায় অনাকাঙ্খিত এতসব ঘটনা ঘটছে। গত ৩ অক্টোবর, ২০১৬ ইং তারিখে সমকাল পত্রিকার এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'মালিকরা গা ঢাকা দিয়েছে বিপদে ১২ হাজার শিক্ষার্থী'। এতে উল্লেখ করা হয়, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের চার মালিকপক্ষের শীর্ষ ব্যক্তিদের সবাই গা-ঢাকা দিয়েছেন। কেউ কেউ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তারাও তাদের খুঁজে পাচ্ছেন না। এতে ১২ হাজার শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। অদ্ভুত বিষয় নয় কি? মানুষের মেধা ও মননের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে কত ছোট করতে পারে। ভাবা যায়? আমাদেরকে তাই ভাবতে হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে শিক্ষিত মানুষেরা কিভাবে নিজেদের আত্মমর্যাদা বিলিয়ে দেয়। গত ০৪ এপ্রিল, ২০১৬ ইং তারিখে কালের কণ্ঠ পত্রিকায় শরিফুল আলম সুমনের 'অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় টিউশন ফি ট্রাস্টিদের ভাগবাটোয়ারা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্বদ্যিালয় হবে সম্পূর্ণ অলাভজনক। বিশ্বদ্যিালয়ের খরচ বাদে আয়ের পুরো অর্থ ব্যবহার হবে উন্নয়নকাজে। অথচ উল্টো নিয়মে চলছে অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বদ্যিালয়। মাস শেষে টিউশন ফি নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা। এমনকি কে কত টাকা নেবেন তা বোর্ড সভার কার্য বিবরণীতে আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেয়া আছে। আর যারা সরাসরি টাকা নিতে পারেন না তাঁদের বিশ্বদ্যিালয়ে সন্মানজনক পদে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে টিউশন ফির ভাগ। এমনকি ট্রাস্টি বোর্ডের কয়েক সদস্যের বিরুদ্ধে সনদ বাণিজ্যের অভিযোগও রয়েছে।

দেশের প্রকৃত টেকসই উন্নয়নে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রতি বছরে বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। তাই সামগ্রিক শিক্ষা খাতের ব্যয়কে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতের উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছি। বাস্তবে কি তাই দেখতে পাচ্ছি?

দেশ ও সমাজের সেবায় মানুষকে উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রধান মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মানবিক গুণগুলো বিকশিত হবে। একজন মানুষ দেশ প্রেমিক, মানব হিতৈষী তথা নিজের কর্ম দক্ষতাকে মানব কল্যাণে ব্যয় করবে। একজন শিক্ষার্থী গণিত, দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, ললিতকলা, বিজ্ঞান বিষয়গুলো রপ্ত করার পাশাপাশি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে। নিজ দেশ ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনোবৃত্তি, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হবে। বিশ্ব বাস্তবতা উপলব্ধি করে নিজ দেশের অবস্থান নির্ণয় করবে। শিক্ষায় কর্পোরেট সংস্কৃতি সম্ভবত এ বিষয়টি উপেক্ষা করে একজন মানুষকে কেবল নিজের ভোগবিলাসী জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অর্থ উপার্জনই মানুষের জীবনের প্রধান কাজ। অর্থ উপার্জনে নীতি নৈতিকতা, বিবেক, বিবেচনা বোধ বিবেচিত হয় না। অর্থ উপার্জনই যেন মূল কাজ। আমাদের দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কেবল

দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ তৈরীর দিকে তাকালে চলবে না। মননশীল, দেশ ও জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, সৎ, দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী তৈরীর দিকে নজর দিতে হবে। উদার, মুক্তমনা, অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মননশীল, সংস্কৃতিবান নাগরিক তৈরী করে তারপর দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ তৈরীর কথা ভাবতে হবে। শিক্ষায় কর্পোরেট সংস্কৃতি এ ধরনের মানব সম্পদ তৈরীতে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। সুতরাং, কর্পোরেট সংস্কৃতি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নীরব ঘাতক। প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি। শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রসারের কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্যণীয়।

১. শিক্ষা সেবা নয়, পণ্য হিসেবে বিবেচিত।
২. শিক্ষার অধিকার কেবল মাত্র স্বচ্ছল ঘরের ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত।
৩. শিক্ষকের মর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি উপেক্ষিত।
৪. শিক্ষাব্যবস্থা দিনে দিনে মুনাফালোভী চক্রের হাতে জিম্মি হচ্ছে।
৫. গুণগত শিক্ষা নয়, ফলাফল সর্বস্ব শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে যাচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট আমাদের দেশ, সমাজ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন, প্রসার, মানব কল্যাণের সাথে সাংঘর্ষিক। অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে যাচ্ছে। বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকেরা দেখতে পাচ্ছে টিউশনি করে, কোচিং বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়। ফলে তারাও অধিক উপার্জনের আশায় টিউশনি, কোচিং এর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। স্কুলে যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে শিক্ষাদানের বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের বাইরে পড়াতে আগ্রহী হচ্ছে। ফলে একজন শিক্ষকের আন্তরিকতা, মমতা ও যত্নের সাথে শিক্ষাদানের সুযোগ কেবলমাত্র স্বচ্ছল ঘরের ছেলে-মেয়েরা পাচ্ছে।

শিক্ষা বঞ্চিত, নিরক্ষর, স্বল্প আয়ের শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এভাবেই। আর তাই সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার কাজটি দিনে দিনে কঠিন হয়ে পড়ছে। কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না শিক্ষার হার। কাড়ি কাড়ি অর্থ ব্যয় করে হাজারো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে বলা হলেও এদেশের অবহেলিত জনগোষ্ঠী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। আমাদের মত দেশে দ্রুত শিক্ষার প্রসার জরুরি। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি হয়। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি বিস্তৃতিরই একটি কালো দিক। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি শিক্ষার প্রসার নয়, সংকুচিত করে। আর আমাদের সমাজে এ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা মানে পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় এক অশনি সংকেত।

৬. গণমাধ্যমের ভূমিকা

শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যমগুলো এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোর ভালো ফলাফল এমনভাবে প্রচার করে যাতে তাদের সুনাম দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃত শিক্ষার উন্নয়নে একটি প্রতিষ্ঠানে যেমন প্রতি বছর শতভাগ ফেল করা কাঙ্ক্ষিত নয় তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর সবাই পাশ করার বিষয়টিও অস্বাভাবিক। শতভাগ জিপিএ-৫ পেলে ভালো প্রতিষ্ঠান এবং শতভাগ ফেল করলে খারাপ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করার চেয়ে কেন একটি প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর শতভাগ জিপিএ-৫ পায় এবং কেন আরেকটি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ফেল করে তার কারণ

অনুসন্ধান করা জরুরি। আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো তাদের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় কারণ চিহ্নিত না করে ভালো ফলাফল করে এমন প্রতিষ্ঠানের সুনাম প্রচারে ব্যতিব্যস্ত থাকে।

মনে করা যাক, 'ক' নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। দেশব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম রয়েছে। ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকায় এই প্রতিষ্ঠানের শাখা রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা হতে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসে। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রধান মানদণ্ড হলো আর্থিক স্বচ্ছলতা। এছাড়া প্রতি বছর ভর্তি পরিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ভর্তি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের ফলাফল দেখে যাচাই বাছাই করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরই নজর কাড়া ফলাফল করে থাকে। জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেই এ প্রতিষ্ঠান পত্রিকার প্রধান শিরোনাম হয় প্রায় প্রতি বছরই। প্রশ্ন হলো, এভাবে ফলাফল অর্জন সমর্থনযোগ্য কি না? অবশ্যই না। ভালো ফলাফল অর্জন করলেও এধরনের প্রতিষ্ঠান প্রশংসা পেতে পারে না। গণমাধ্যমগুলো যদি তা করে তাহলে তা হবে অযৌক্তিক। এই প্রশংসা সমাজে বৈষম্য ও অস্থিরতা তৈরী করবে। এ বিষয়ে গণমাধ্যমগুলোকে আরো সজাগ, সচেতন ও সতর্ক হওয়া উচিৎ। ধরা যাক, রাঙামাটি জেলার বড়কল উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি বিদ্যালয়ের নাম 'খ' যেখানে ৫০০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। এখন 'খ' স্কুলের ৫০০ জন শিক্ষার্থি যদি 'ক' স্কুলে প্রতিস্থাপন করা যায় এবং ঐ স্কুল ভালো ফলাফল করে তবেই তা প্রসংশনীয় ও সমর্থনযোগ্য। গণমাধ্যম কেবল তখনই ঐ প্রতিষ্ঠানের স্তুতি ও প্রশংসা গাইতে পারে।

যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব শিক্ষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও দক্ষতায় দেশ ও জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে ধারাবাহিক ভালো ফলাফল করে তাহলেই তা সমর্থনযোগ্য। শুধুমাত্র সে প্রতিষ্ঠানই প্রশংসার দাবী রাখে। মনে করা যাক, একটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কোন ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে না। স্বচ্ছল ঘরের ছেলে-মেয়েদের এখানে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করে না। ভর্তি ফি বেতনের পরিমাণও সামান্য বা স্বল্প। এখানে দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারে। এমন একটি প্রতিষ্ঠান যদি ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করে আমাদের সমাজে কেবল এমন প্রতিষ্ঠানই সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যৌক্তিক। এ প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে। এতে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন ও প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠান এরকম চর্চা বাদ দিয়ে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষাকে পণ্য বানিয়ে কৃত্রিমভাবে অথবা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করে আসছে।

গণমাধ্যমগুলো এমন গর্হিত কাজের সমালোচনা না করে বরং তাদের গুণগান গেয়ে চলছে। শতভাগ ফেল করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত না করে বরং তাদের দুর্নাম রটাচ্ছে। এতে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা বাণিজ্যকরণের পথ আরো উন্মুক্ত হচ্ছে। বৈষম্য, অস্থিরতা, বিভেদ ও বিভাজন বাড়ছে। দেশের স্বার্থে, শিক্ষার হার বৃদ্ধির স্বার্থে গণমাধ্যমগুলোকে আরো দায়িত্বশীল ও যত্নশীল হওয়া জরুরি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি শিক্ষার জন্য সুখকর নয়। এটি কোনো শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। ভর্তি পরিক্ষা হবে কেবল উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ভর্তি পরীক্ষা নয় এমন একটি সংস্কৃতি আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা হওয়া জরুরি। উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কিন্তু, সর্বক্ষেত্রে কেন তা হচ্ছে না? এ দেশের সব মানুষকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার মূল বাধা কী? এ বিষয়ে গণমাধ্যমগুলোর কোনো পর্যবেক্ষণ খুব একটা নজরে পড়ে না।

একটি দেশের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার তথা জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার ভূমিকা কতটুকু হবে? শিক্ষার ধরন, দর্শন, সমস্যা, অসুবিধা, উত্তরণ, সম্ভাবনা ইত্যাদি সব বিষয়ে গণমাধ্যমের পর্যবেক্ষণ থাকা জরুরি। একই সাথে শিক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার সুযোগ আছে। বাংলাদেশের মত দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। বাংলাদেশকে প্রসারমান দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে বের করা, দেশব্যাপী আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা আমাদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। GINI অনুপাত বেড়ে চলছে। এমন বাস্তবতায় একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়ে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্র অনেক বড়। কিন্তু, আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কি? তাদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ। গণমাধ্যমগুলো খেলার খবর, বিনোদন বা খুন-খারাবিসহ নেতিবাচক খবরগুলো খুব গুরুত্বসহ প্রচার করে থাকে। তেমনি শিক্ষার মত জরুরি সেবাখাতের বেহাল দশা নিয়ে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনার বিষয়গুলো অবহেলিত, উপেক্ষিত হচ্ছে। যেন কর্পোরেট আদলে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম প্রচারই তাদের কাজ। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের এ রকম আচরণ অনেকাংশে দায়ী।

শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষা বাণিজ্যিকরণের এই সংস্কৃতি একজন শিক্ষকের দেশ, সমাজ ও মানুষের প্রতি যে দায়বদ্ধতা, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ও আন্তরিকতা থাকে তা শূণ্যের কোটায় নামিয়ে আনে। এতে অর্থই হয়ে ওঠে শিক্ষা প্রদানের মূল মাধ্যম। এটা সত্য, আগে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের যে দরদ, মমতা, আন্তরিকতা ছিল দু'একজন ব্যতিক্রম বাদে এ যুগের শিক্ষকদের মধ্যে তা দেখা যায় না। শিক্ষা বাণিজ্য শিক্ষকদের এ মহান গুণটুকু কেড়ে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠান নয় শিক্ষা অর্জনের মূল ভূমিকা এখন পরিবারের হাতে। প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এখন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন সুনাম অর্জনের জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়- অভিভাবকরাও তাদের ছেলে-মেয়েদের এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সরকার, গণমাধ্যমের সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলে যায়। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীকে পড়াতে বছরে লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। দেখা যায়, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ধর্মসহ বাংলা প্রথম পত্রের মত বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের চাইতে শিশুদের পড়াশুনায় পরিবারের গুরুত্বই বেড়ে চলছে। শিক্ষকদের একটি অংশ ক্রমশ বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে। দেশ ও সমাজের জন্য এটি কোনো শুভ লক্ষণ নয়। কেন হচ্ছে? এ ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলোর কোনো উৎসাহ নেই।

৭. সুপারিশ মালা

দেশের প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে যাতে শিক্ষা হয় সুলভ ও সহজলভ্য। আর এ জন্য প্রয়োজন একটি সুষম, সুন্দর, অর্থবহ, গণমূখী শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিটি শিশুকে শিক্ষিত করতে সক্ষম না হলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হতে পারে না। আজ বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে আমাদের দেশে তা নিশ্চিত করতে চাইলে প্রতিটি শিশুর জন্যই শিক্ষার সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠ্যক্রম এবং সহ পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। আর এজন্য সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষাকে কর্পোরেট সংস্কৃতির কবল থেকে মুক্ত করা। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি আমাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন তথা সুস্থ ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিবন্ধক। দেশ ও গণমানুষের স্বার্থে,

উন্নয়নের স্বার্থে যেকোনো মূল্যে এ সংস্কৃতি প্রতিহত করতে হবে। একটি সুন্দর, সুষম, গ্রহণযোগ্য, গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো।

১. সব বেসরকারি স্কুল, কলেজ দ্রুততম সময়ে জাতীয়করণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো দিতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক ও অআর্থিক সুবিধা বাড়িয়ে তাদের মর্যাদা বাড়াতে হবে।

২. বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা বাণিজ্য করে যারা প্রচুর অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছে তাদের তালিকা তৈরী করতে হবে। একই সাথে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বাণিজ্য করছে তাদের তালিকা তৈরী করে ব্যবস্থা নিতে হবে। বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচার শতভাগ বন্ধ করতে হবে।

৩. সব বিদ্যালয়ে অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে। বেতন হার, ভর্তি ফি সারা দেশে একই থাকবে।

৪. বিভিন্ন নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। ভর্তি ফি-তে কী কী বিষয় থাকবে এবং প্রতিটি ক্যাটাগরিতে কি পরিমাণ ফি থাকবে তা জাতীয়ভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মাসিক বেতন আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার আগে কোচিং-এর নামে কোচিং ফি আদায়ের সংস্কৃতি দেশব্যাপী চালু আছে। একই সাথে মডেল টেস্ট নেয়ার নামেও ফি আদায় করা হয়। এ ধরনের ফি সারা দেশে যেন একই পরিমাণ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়। এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের বাইরে গণমাধ্যম এর বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষায় কর্পোরেট সংস্কৃতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং এর নেতিবাচক দিক পর্যবেক্ষণ, এই সংস্কৃতি থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ, গবেষক, জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের মানুষকে সোচ্চার হতে হবে।

৭. **শেষ কথা:** শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্কৃতি দেশ ও জাতির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কর্পোরেট সংস্কৃতির মূল কথাই হলো মুনাফা। শিক্ষার মত জরুরি সেবাকে পণ্যে পরিণত করে মুনাফা অর্জনের সংস্কৃতি পুরো শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অশনি সংকেত। প্রকৃত টেকসই উন্নয়নে যেকোনো মূল্যে একটি সুন্দর ও সুস্থ ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং একই সাথে কর্পোরেট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে অস্থির ও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। এ থেকে পরিত্রাণে নতুন করে সুন্দর, গোছানো, পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুতরাং, কাল বিলম্ব না করে এখনই আমাদের এই সংস্কৃতি নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. Farashuddin, Mohammed. Education, Employment and Equity: The Bangladesh Context, BEA: SMS Kibria Memorial Lecture. BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, Volume 26 Number 1, June 2010.
2. Marching towards Growth, Development and Equitable Society, Budget Speech, 2016-17, Ministry of Finance, Peoples Republic of Bangladesh, 02 June, 2016.
3. Internet.
4. Zaman, Jasimuz. Rural High Schools in Bangladesh: An Experiment on Quality Education, Bangladesh Education Journal, Volume-15, Number – 2, December, 2016.

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬।

৬. চক্রবর্তী, উত্তরা, যবনিকা সরে যায়, শিক্ষা: এক নিঃশব্দ বিপ্লব, সম্পাদনায় স্বরাজ সেনগুপ্ত, রেনেসাঁস, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৬।

৭. জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৮. মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য (নবম-দশম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১৪।

৯. মিত্র, বিনয় : বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা রূপ ও রীতি, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

১০. সমকাল, ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথম আলো Daily Star, DhakaTribune সহ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকশিত প্রতিবেদন, কলাম, ফিচার।